অধ্যায় - ৩৭

চাওড়ী সমারোহ

এই অধ্যায়ের শুরুতে বেদান্তের কোন কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে হেমাডপন্ত 'চাওড়ী'র অপূর্ব সমারোহ বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

ধন্য শ্রীসাই, যাঁর যেমন জীবন তেমনি অবর্ণনীয় লীলাবিলাস এবং অদ্ভুত কার্য্যকলাপে ভরা তাঁর দৈনিক কর্মসূচী। কখন তো তাঁকে সমস্ত সাংসারিক কর্ম থেকে অলিপ্ত থেকে কর্মকাণ্ডীর ন্যায় মনে হত। আবার কখনো তিনি ব্রহ্মানন্দে ও আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন থাকতেন। যদিও কখনো-কখনো তাঁকে দেখে পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মনে হত, তবুও তিনি অলস ছিলেন না। প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় সর্বদা গম্ভীর, শান্ত ও স্থির থাকতেন। তাঁর প্রকৃতি বা স্বভাব বর্ণনা করা আমাদের সামর্থের অতীত। তিনি পুরুষদের ভাই-য়ের মতো এবং নারীদের মা-য়ের বা বোন-য়ের মতো দেখতেন। সকলেই জানে তিনি ছিলেন চিরকুমার ও প্রকৃত ব্রহ্মচারী। তাঁর সঙ্গতিতে আমরা যে অনুপম জ্ঞান উপলব্ধি করেছি তার বিস্মৃতি মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন না হয়- তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই বিনম্র প্রার্থনা। প্রতিটি জীবের মধ্যে তাঁকে দর্শন করে, নাম স্মরণের রসানুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে যেন তাঁর মোহবিনাশক চরণের অনন্যরূপে সেবা করতে পারি, এই আমাদের আকাঙ্খা। হেমাডপন্ত নিজের মত অনুসারে বেদান্তের বিবরণ দিয়ে 'চাওড়ী' সমারোহ বর্ণনা করেছেন।

চাওড়ী সমারোহ ঃ-

বাবার শয়নকক্ষের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। তিনি একদিন মস্‌জিদে ও পরের দিন 'চাওড়ী'তে শুতেন। এইরকম ব্যবস্থা তাঁর মহাসমাধি পর্যন্ত চলে। 'চাওড়ী'তে নিয়মিত রূপে ভক্তরা তাঁর পূজা-অর্চনা ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০৯ সাল থেকে শুরু করে দিয়েছিল। এবার তাঁর শ্রীচরণের ধ্যান করে আমরা 'চাওড়ী' সমারোহ বর্ণনা শুরু করব। এত মনোহর ছিল সেই দৃশ্য যে ভক্তরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। বোধশক্তি হারিয়ে এই কামনাই করত যে সেই দৃশ্য যেন কখনো তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়।

'চাওড়ী'তে বিশ্রাম করার পালা এলে সেই রাত্রিতে ভক্তদের দল মস্‌জিদের সভা-মণ্ডপে জমায়েত হয়ে ঘন্টার-পর-ঘন্টা ভজন করত। সেখানেই একদিকে সুসজ্জিত রথ রাখা থাকত এবং অন্য দিকে তুলসী বৃন্দাবন। রসিক ভক্তরা সভা-মণ্ডপে করতাল, মৃদঙ্গ, কানজিরা, ঢোল ইত্যাদি নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ভজন শুরু করে দিত। এই সব ভজনান্দী ভক্তদের চুম্বকের মত আকর্ষিত শ্রীসাই বাবাই করতেন।

মস্‌জিদের প্রাঙ্গনে দেখো ভক্তরা কত উৎসাহের সাথে নানা রকমের মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন করতে ব্যস্ত। কেউ প্রদীপ জ্বালাচ্ছে ত কেউ পাল্কি এবং রথ সাজাচ্ছে। শ্রীসাই বাবার জয় জয়কার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। প্রদীপের আলোতে ঝলমলে মস্‌জিদকে দেখে এমন মনে হচ্ছে যেন মঙ্গলকারিনী দীপাবলী স্বয়ং শিরডীতে বিরাজমান। মস্‌জিদের বাইরে দৃষ্টিপাত্ করলে দেখা যাবে যে দ্বারে শ্রীসাই বাবার ঘোড়া শ্যামসুন্দর পূর্ণ সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে শ্রী সাইবাবা চুপ করে নিজের গদিতে বসে আছেন। এমন সময় ভক্তদের সাথে তাত্‌য়া পাটীল এসে বাবাকে তৈরী হয়ে নিতে বলেন। তাঁকে বাহুমূলে ধরে উঠতে সাহায্য করেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তাত্‌য়া বাবাকে 'মামা' বলে ডাকতেন। বাবা কফ্‌নী পড়ে, বগলে ছোট লাঠিটা দাবিয়ে, ছিলিম ও তামাক নিয়ে কাঁধে একটা কাপড় রেখে প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন তাত্‌য়া পাটীল তাঁর কাঁধে একটা সোনালী জরির শাল রাখেন। এরপর বাবা ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য নিজে তাতে কিছু কাঠ ঢেলে ধুনির কাছে রাখা প্রদীপটি হাত দিয়ে নিভিয়ে 'চাওড়ী' অভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে-সঙ্গেই নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু করে। নানা রঙের আতশবাজী শুরু হয়। স্ত্রী-পুরুষেরা বাদ্যযন্ত্রের সাথে তাঁর কীর্তির ভজন গাইতে-গাইতে তাঁর সামনে-সামনে চলছে। কেউ আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করছে তো কেউ অনেক রকমের পতাকা ও নিশান নিয়ে চলেছে। যেই বাবা মস্‌জিদের সিঁড়িতে চরণ রাখেন, অমনি খালদাররা খুব উচ্চ স্বরে তাঁর প্রস্থান ঘোষণা করে। দুদিক দিয়ে লোকে চামর দিয়ে তাঁকে হাওয়া করছে। এরপর রাস্তার উপর দূর অবধি বেছানো কাপড়ের উপর দিয়ে সমারোহ এগোতে লাগল। তাত্‌য়া পাটীল বাবার বাঁ হাত এবং মহালসাপতি ডান হাত ধরে আছেন। বাপুসাহেব যোগ ছাতা নিয়ে চলছেন। এঁদের সামনে পূর্ণ সুসজ্জিত অশ্ব শ্যামসুন্দর চলেছে। পেছনে ভজন মণ্ডলী ও ভক্তদের সমূহ বাদ্যধ্বনির সাথে সমস্বরে হরি ও সাইনাম করতে-করতে এগিয়ে চলেছে। এবার সমারোহ 'চাওড়ী'র কোণে এসে পৌঁছেছে। সবাই যেন এক অপার আনন্দ ও ঘন স্বর্গসুখে ডুবে আছে। বাবা যখন 'চাওড়ী'র সামনে এসে দাঁড়ান তখন তাঁর মুখের দিব্যপ্রভা বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন অরুণোদয়ের সময়

উজ্জ্বল রশ্মির ছটা ছড়িয়ে আছে। উত্তরের দিকে মুখ করে তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তিনি কারো আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। বাদ্যযন্ত্র আগের মতই বেজে চলেছে এবং এই সময় কাকাসাহেব দীক্ষিত আবীরের বর্ষা করলেন। বাবার মুখমণ্ডলে এমন অপূর্ব রক্তিম আভা জ্বলজ্বল করে ওঠে যে তা দেখে ভক্তদের হৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠল। এই মনোহর দৃশ্য ও উৎসবের বর্ণনা শব্দে করার সামর্থ আমার নেই। ভাবে বিভোর হয়ে ভগত মহালসাপতিও নাচছেন। দিয়েছেন। কিন্তু বাবার অটুট একাগ্রতা দেখে সবাই হতবাক। এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে তাত্য়া পাটীল বাবার বাঁ দিকে এবং অলংকার ইত্যাদি নিয়ে মহালসাপতি ডান দিকে রয়েছেন। দেখো তো, কি অপরূপ এই সমারোহের শোভা! এই দৃশ্যের ক্ষণিক দর্শন পাওয়ার জন্য সহস্র নর-নারী, ধনী-দরিদ্র সেখানে জমায়েত হয়েছে। এবার বাবা ধীরে-ধীরে হাঁটতে শুরু করেন। চারিদিকের সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডল আনন্দে দুলছে। এই ভাবে সমারোহ 'চাওড়ী' পৌঁছয়। ভবিষ্যতে আর এই দৃশ্য কেউ দেখতে পাবে না। এখন তো শুধু সেটি মনে করে চোখে সেই মনোরম অতীত কল্পনা করে নিজের হৃদয়ের ব্যাকুলতা শান্ত করতে হবে। 'চাওড়ী' কে সুন্দর-সুন্দর কাঁচ এবং গ্যাস লণ্ঠন দিয়ে সাজানো হয়েছে। 'চাওড়ী'তে পৌঁছতেই তাত্য়া পাটীল এগিয়ে গিয়ে আসন বিছিয়ে বালিশে ঠেসান দিয়ে বাবাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে একটা ভালো চাপকান পরিয়ে ভক্তরা নানা ভাবে তাঁর পূজো শুরু করে। বাবাকে সোনার মুকুট পরিয়ে ফুল ও মণি-মুক্তার হার তাঁর গলায় পরায়। তারপর কপালে কুমকুমের বৈষ্ণবী তিলক এবং তারমধ্যে গোল টিপ লাগিয়ে অনেকক্ষণ অপলক তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁর মাথার কাপড়টা বদলে দেওয়া হয়। খানিকক্ষণ সেটা উপরেই ধরে রাখা হয় - সবার ভয় যে বাবা সেটা ফেলে না দেন। কিন্তু বাবা তো অন্তর্যামী। তিনি ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে তাদের এই সব কর্মকাণ্ড মাথা পেতে মেনে নিচ্ছিলেন। সেই সব আভূষণে সুসজ্জিত হওয়ার পর তো বাবার শোভা অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

নানাসাহেব নিমোনকর একটি বড়, সুন্দর ঝালোরযুক্ত ছাতা মাথার উপর ঘোরাচ্ছিলেন। বাপুসাহেব যোগ রূপোর এক সুন্দর থালাতে বাবার পাদপ্রক্ষালন করেন এবং অর্ঘ্য অর্পণ করার পর রীতিসম্মতভাবে তাঁর পূজো-অর্চনা করেন। তাঁর হাতে চন্দন লাগিয়ে একটা পান দেন। তাত্য়া পাটীল ও অন্যান্য ভক্তরা তাঁর শ্রী চরণে লুটিয়ে পড়লেন। দুদিক দিয়ে ভক্তরা চামর ও পাখা দোলাচ্ছে। শামা ছিলিম তৈরী করে তাত্য়া পাটীলকে দেন। উনি সেটি ভালো করে জ্বালিয়ে বাবার কাছে দিলেন। বাবার ছিলিম টানা শেষ হলে সেটা ভগত্ মহালসাপতিকে এবং তারপর বাকি ভক্তদের দেওয়া হয়। ধন্য সেই

নির্জীব ছিলিম। কি মহান তার তপস্যা! কুমোরের চাকায় ঘুরে, রোদ্দুরে শুকিয়ে, তারপর আগুনে পুড়ে- কতই না কৃচ্ছ্রসাধনের পরীক্ষা তাকে দিতে হয়েছে। তবে গিয়ে সে বাবার কর স্পর্শ ও চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে। এই সব হয়ে যাওয়ার পর ভক্তরা বাবাকে ফুলের মালা দিয়ে বোঝাই করে ফুলের তোড়াও উপহার দেয়। বাবা তো বৈরাগ্যের পূর্ণ অবতার ছিলেন, সেই হীরে-পান্না ও ফুলের হার বা এই ধরনের সাজ-গোজে তাঁর কোন আকর্ষণ বা রুচি থাকতে পারে কি? কিন্তু ভক্তদের ভাব ও আন্তরিক প্রেমের টানে, তারা যাতে খুশি হয়, তিনি কোন আপত্তি করলেন না। সব শেষে মাঙ্গলিক স্বরে বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু হয় এবং বাপুসাহেব যোগ বাবার যথাবিধি আরতি করেন। আরতি শেষ হতেই ভক্তরা বাবাকে প্রণাম করে একে-একে বিদায় নিল। এবার তাত্য়া বাবাকে ছিলিম পান করিয়ে, গোলাপজল, আতর ইত্যাদি লাগিয়ে একটা গোলাপ ফুল দিলেন। তিনি যখন বিদায় নিতে গেলেন তখন বাবা ভালবেসে বলেন- "তাত্য়া, আমার দেখা-শোনা ভালোভাবে করো। তুমি বাড়ী যেতে চাও, যাও। কিন্তু রাত্তিরে মাঝে-মধ্যে এসে আমায় একটু দেখে যেও।" তাত্য়া সে কথার আশ্বাস দিয়ে বাড়ী ফিরে যান। তারপর বাবা অনেকগুলো চাদর বিছিয়ে নিজের বিছানা তৈরি করে বিশ্রাম নিলেন।

এবার আমরাও এখানে বিশ্রাম নেব এবং এই অধ্যায়টি শেষ করে পাঠকদের কাছে একটি অনুরোধ জানাই- তাঁরা যেন প্রতিদিন শয্যা গ্রহণের পূর্বে সাইবাবা ও তাঁর 'চাওড়ী' শোভাযাত্রা স্মরণ করেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।